সনাতনী টিভির ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ

মোস্তাফা জব্বার

টিভির বৃন্তচ্যুত হওয়ার খবর দিয়েই লেখাটির ভূমিকা তৈরি করতে পারি। আমার ছেলে বিজয়ের জন্ম '৯৩ সালের অক্টোবরে। ওকে গোসল করানো থেকে খাওয়ানো অবধি সব কিছু টিভিতে কার্টুন দেখিয়ে করতে হতো। একটু বড় হলে চার বছর বয়সে ওকে আমেরিকান শিক্ষামূলক সফটওয়্যার দিয়ে টিভির সময় কমানো সম্ভব হয়। আরও একটু বড় হওয়ার পর টিভির সাথে বই যোগ হয়। আমাকে দেশের বই তো বটেই, আমাজন ডটকম থেকে বই কিনে দিতে হয়েছে। সেই সময়েই তার প্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কমপিউটার গেমস। কিন্তু তাকে একটি আলাদা টিভি দিতেই হতো। এরপর আমরা ইন্টারনেটের যুগে পড়লাম। দৃশ্যটা আমূল পাল্টে দিল ইন্টারনেট। টিভির সময় কমতে থাকল আর ইন্টারনেটের স্পিড বাড়তে থাকল। যখন সে তার স্নাতক স্তরে পড়ার সময়ে পৌঁছাল, তখন একদিন সে তার মাকে জানাল– ওর ঘর থেকে যেন টিভিটা সরিয়ে ফেলা হয়। এখন তার ঘরে টিভি নেই। সম্ভবত আর কখনও টিভির পর্দায় সে তাকাবে না।

টিভির জন্মের পর ধারণা করা হয়েছিল– কাগজ, রেডিও, সিনেমা এবং অন্য মাধ্যমগুলো হয়তো টিভির দাপটের কাছে টিকে থাকবে না। বিশেষ করে রেডিও টিভির দাপটের জন্য প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়ে এবং সম্প্রতি এফএম রেডিওর জাগরণের আগে রেডিও প্রায় বিলুপ্তির পথেই চলে গিয়েছিল। অন্যদিকে কমিউনিটি রেডিও বিশেষায়িত কাজে বিশেষ অবদান রাখা শুরু করেছে। কিন্তু টিভি কাগজের বিকল্প হয়ে যায়নি। একটি সময় পর্যন্ত টিভির সম্প্রসারণের পাশাপাশি কাগজের গণমাধ্যম বিলুপ্ত না হয়ে বরং প্রসারিত হয়েছে। আরও ধারণা করা হয়েছিল, টিভির আবির্ভাবের ফলে সিনেমা হারিয়ে যাবে। বাংলাদেশে সিনেমা বিপন্ন হওয়ার প্রধানতম কারণ নিম্ন মান ও পাইরেসি হলেও দুনিয়াজুড়ে সিনেমা একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে এখনও কোনো না কোনোভাবে টিকে আছে। হলিউড বা বলিউডে এখনও সিনেমার সরব উপস্থিতি আছে। এমনকি ইউটিউব সিনেমার দর্শক বরং বাড়িয়েছে। এর সহজ হিসাবটা হলো, টিভি তার নিজের প্রভাব বাড়াতে পারলেও কাউকেই বিলুপ্ত করতে পারেনি। তেমন কোনো ইচ্ছাও সম্ভবত টিভির ছিল না। কিন্তু এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, সামনের দিকে টিভি-রেডিও-কাগজ ইত্যাদি গণমাধ্যমের রূপান্তর কেমন করে হবে? কি রকম হবে? কতটা হবে?

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালে টিভির জন্ম হওয়ার পর সেটি নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে সাদা-কালো সরকারি টিভি ছিল। সেটি প্রচারিত হতো টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে। সরকারি চ্যানেল পিটিভি বা বিটিভি ছাড়া আর কারও এখনও টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের অনুমতি নেই। মাঝখানে একুশে টিভির তেমন একটি অনুমতি থাকার পরও সেটি বাতিল হয়েছে। সেই সময়ে অ্যান্টেনা দিয়ে টিভি সেটে টিভি দেখা যেত। পরে সেই টিভি স্যাটেলাইট সম্প্রচারে গেছে, রঙিন হয়েছে এবং বেসরকারি মালিকানায় বিপুলসংখ্যায় জন্ম নিয়েছে। এক সময়ে টিভি স্টুডিওকেন্দ্রিক থাকলেও এখন মাঠে-ময়দানে এবং তাৎক্ষণিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। টিভির যন্ত্রপাতিতেও নানা পরিবর্তন এসেছে। ফিল্ম, বিএনসি, ইউম্যাটিক, বেটা থেকে ডিভি-এইচডির প্রবাহমান ধারায় এখন পুরোই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার জয়জয়কার। তবে যে জায়গাটিতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেটি হলো টিভি সেট। একসময়ে ক্যাথোড রে টিউবভিত্তিক সাদা-কালো টিভি সেট এখন বড়জোর এলসিডি-এলইডি ও কালার হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড ১৯-২০ ইঞ্চির টিভি ৪২-৫২ বা তারও বেশি বড় হয়েছে। অ্যান্টেনার যুগ পার হয়ে এখন আমরা ক্যাবল বা ডিশ ও ডিশ লাইন কিংবা ডিরেক্ট টু হোমের যুগে এসেছি। টিভি সম্প্রচার বিতরণের সবশেষ প্রযুক্তিটার নাম বোধহয় ডিরেক্ট টু হোম। পাশের দেশ ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও সহসাই এই ব্যবস্থা চালু হবে বলে আমরা আশা করছি। অবৈধভাবে এই ব্যবস্থা অনেক বাড়িতেই চালু আছে। সহসাই বেক্সিমকো নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্র বাজারজাত করবে বলে জানা গেছে।

আপনি যদি ইন্টারনেটে টিভির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুসন্ধান করেন, তবে দেখবেন কেউ বলছে টিভির ভবিষ্যৎ হচ্ছে মোবাইল ফোন। কেউ বলছেন টিভি মানে ইন্টারনেট বা কেউ বলছেন আরও নতুন কিছু। আমরা বাংলাদেশে এতসব ভাবি না। ফলে প্রচলিত ধারার সাথে যতটা নতুনত্ব আসে তাতেই আমরা তৃপ্ত হই। আমাদের টিভি দেখা মানে মহিলাদের ভারতীয় সোপ অপেরা দেখা আর চায়ের স্টল ও আড্ডাখানাসহ বাড়ির পুরুষদের বাংলাদেশি টকশো দেখা। এজন্য ডিশের ক্যাবল লাইন হচ্ছে একমাত্র বাহন। ঘরে ১৪ থেকে ৪২ ইঞ্চি আকারের টিভি যাতে সিআরটি, এলসিডি বা এলইডি থাকতেই পারে।

কিন্তু অবস্থাটি এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। গত ৪ মে ২০১৫ দৈনিক প্রথম আলো ছোট একটি খবর ছাপে। খবরটি এরকম– 'মাঠে তখন চলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের তৃতীয় ওয়ান ডে। আর ক্রিকেটের ভক্ত সুমন কি না বসে আছে বাসে, আটকে গেছে যানজটে। সাধারণত জগন্নাথ হলের টিভি রুমেই বন্ধুদের নিয়ে হই-হুল্লোড় করে দেখে খেলা। কিন্তু আজ হলে ফিরতে দেরিই হয়ে যাবে, যে যানজট রেডিওতে ধারাভাষ্য শুনছেন ঠিকই, কিন্তু এতে কি আর দেখার সাধ মেটে? এমন সময় ফেসবুকের একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'মোবাইল টিভি' সম্পর্কে ধারণা পান সুমন। ব্যস, সাথে সাথেই সেটা চালু করে নিলেন। বাসের সবাই মিলে জ্যামে বসেই সাক্ষী হলেন আরেকটি বাংলাওয়াশের।'

কী এই মোবাইল টিভি? টুজি বা থ্রিজি মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে দেশের যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় মোবাইলের নির্দিষ্ট অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইল ফোনেই টিভির সব অনুষ্ঠান দেখার প্রযুক্তি হলো মোবাইল টিভি। এই সেবা দিচ্ছে মিডিয়াকম লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক সম্পর্ক বিভাগের অ্যাকাউন্ট সুপারভাইজার খন্দকার আহসানুজ্জামান বলেন, 'মোবাইল টিভির কল্যাণে বিনোদন এখন পুরোপুরি হাতের মুঠোয় যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময়।' তিনি জানান– বাংলালিংক, রবি, টেলিটক ও এয়ারটেলের সিম ব্যবহার করে উপভোগ করা যাবে মোবাইল টিভি। জাভা, অ্যান্ড্রয়িড, আইওএসচালিত ফোনে চলবে এটি। নির্ধারিত ফির বিনিময়ে নিবন্ধন করতে হবে। এ জন্য দিতে হবে বাংলালিংক (মাসিক ৪০ টাকা), টেলিটক (মাসিক ৮০ থেকে ১৮০ টাকা), রবি (মাসিক ৫০ টাকা), এয়ারটেল (মাসিক ৭২ টাকা)।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান ছাড়াও এতে দেখা যাবে ধারণ করা নাটক, ছবি, টেলিফিল্ম, মিউজিক ভিডিওসহ ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। তবে সরাসরির বেলায় শুধু টিভির চেয়ে ২ সেকেন্ড পরে দেখা যাবে অনুষ্ঠান।

খবরটি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। সুমন বোধহয় একা নয়, অনেকেই তার হাতের মুঠোফোনে টিভি দেখে।। তবে এটি বোঝার বিষয় ▸

আছে, টিভি দেখার যন্ত্রটা টিভি সেট থেকে মোবাইল ফোনে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। আরও একটি বিষয় চোখে পড়ার মতো– মোবাইল অপারেটরেরা টিভি সেবা দিতে শুরু করেছে। মোবাইলে যখন বিনামূল্যে কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়েছে, তখন কথা বলার মোবাইল নেটওয়ার্কের জন্য এমন পথচলা শুরু করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মোবাইল যন্ত্রটি রেডিও শোনার, ছবি তোলার যন্ত্র হয়েই আছে। ইন্টারনেট ব্রাউজ করা ও বিভিন্ন কাজে একে ব্যবহার করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে এই যন্ত্রটির। ফলে ডিজিটাল সভ্যতার ডিজিটাল যন্ত্র বলতে আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় হিসেবে মোবাইলকেই শনাক্ত করতে পারি। মোবাইলের আকার কেমন হবে, এটি অ্যাপলের আইফোন থাকবে, না স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি হবে, না ট্যাবলেট হবে– এসব নিয়ে অনেক লম্বা বিতর্ক হতে থাকবে। কেউ ট্যাবলেটকে ল্যাপটপের বিকল্প বানাবেন, কেউ স্মার্টফোনকে ট্যাবলেটের বিকল্প বানাবেন। তবে সম্ভবত কিছু মৌলিক বিষয় এমন হবে, স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে (হয়তো ল্যাপটপেও) সিম ব্যবহারের সুযোগ একটি অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। ওয়াইফাই-ব্লুটুথ নিয়ে কথা বলার দরকারই নেই।

ঘটনাটি সম্ভবত শুধু মোবাইলে টিভি দেখাতেই সীমিত হয়নি। বাংলাদেশে যারা টিভি দেখেন তারা টিভিকেন্দ্রগুলোর স্ক্রলবারে দেখেন র‍্যাডিয়ান্ট আইপি টিভি নামে একটি অ্যাপ দিয়ে ইন্টারনেট থেকেও টিভি দেখা যায়। এর মানেটি খুবই সহজ। আপনি ইন্টারনেটে যুক্ত থাকলেই টিভি আপনার হাতের মুঠোয়। ইদানিং ইন্টারনেটভিত্তিক টিভি পাওয়া যায়। ফলে টিভি সেটেও ইন্টারনেটের টিভি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বেশ কিছু টিভিকেন্দ্র নিজস্ব অ্যাপ বাজারে ছেড়েছে। সেটি দিয়েও সেই টিভির পর্দা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

একই বিষয়ে আগ্রহী হয়ে আমি কথা বলছিলাম কয়েকজন তরুণের সাথে। ওরা বাংলাদেশে বসে অ্যাফিলিয়েটেড মার্কেটিং করেন। ওদের ব্যবসায়ের খবর জানতে গিয়ে বোঝা গেল, ওরা প্রধানত আমেরিকার টিভি দর্শকদের জন্য খেলার বিষয়গুলোর মার্কেটিং করে। আমেরিকান টিভি চ্যানেলগুলোর স্ট্রিমিং ভিডিও ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে টাকার বিনিময়ে সম্প্রচার করা তাদের ব্যবসায়। তাদের মতে, আমেরিকানরা আমাদের মতো ডিশ লাইনে বা সেটটপ বক্সে টিভি দেখা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। ওদের জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট।

যারা সাম্প্রতিক খবরাখবর রাখেন, তারা জানেন এখন সরাসরি ইন্টারনেটে টিভি সম্প্রচার করতে প্রযুক্তিগত কোনো সমস্যাই নেই। আমি নিজে অনেকগুলো ইন্টারনেট টিভি প্রতিষ্ঠানের ফিতা কেটেছি। আরও আধা ডজন টিভিকেন্দ্র ইন্টারনেট টিভি হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অন্যদিকে প্রচলিত টিভিগুলোকেও সরাসরি অনলাইন সম্প্রচারের পথে পা রাখতে হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত টিভি দেখার জন্য টিভি সেটের কথা ভাবাই দরকার নেই, যদিও আজকালের টিভিগুলো ইন্টারনেট কম্প্যাটিবল হয়েছে। মোবাইল থেকে পিসি– যাই হাতের কাছে এবং যা মানুষকে ইন্টারনেটে যুক্ত করে সেটিই তার টিভি সেট। একই সাথে কোথায় স্যাটেলাইট আছে, কোথায় তরঙ্গ পেলাম বা পেলাম না, সেইসব ভাবনার চেয়ে বড় ভাবনা হলো ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি না।

যারা ইন্টারনেট টিভির পাশাপাশি স্যাটেলাইটেও টিভি সম্প্রচার করতে চান, তাদেরকে এখন আর ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র বা ফ্রিকুয়েন্সি বা তরঙ্গ বরাদ্দ নেয়ার দরকার নেই। ইন্টারনেট সেই কাজটিও করে ফেলেছে। আমরা ক্রমান্বয়ে দুনিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মাধ্যমটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা একটু ব্যাখ্যা করে দেখতে চাই, প্রচলিত টিভি বা সম্প্রচার ব্যবস্থা পুরোই কি রূপান্তরিত হবে? ইদানিং এমন প্রশ্নও দেখা দিয়েছে– ফেসবুক বা ইউটিউব টিভিকে বিলুপ্ত করে দেবে বা টিভির জায়গা দখল করবে। যে টিভি নিজে কাউকে বিলুপ্ত করতে পারেনি, সে অন্যের হাতে বিলুপ্ত হবে?

অনেকেই হয়তো লক্ষ করে থাকবেন– তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক যখনই কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বা সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কেউ বক্তব্য রাখেন, তখন তিনি তার মোবাইলটিকে সেলফি বা মাইক স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে তার বা বক্তার সামনে বসিয়ে রাখেন। কখনও তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা মোবাইলটিকে বক্তার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে থাকেন। অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না ব্যাপারটা কী? কেউ কেউ ভাবেন এভাবে ভিডিও না করলে কি নয়। যারা জানেন তারা বোঝেন এটি শুধু ভিডিও করা নয়, পলক তার ফেসবুকে ভিডিওটিকে সরাসরি সম্প্রচার করছেন। দেশের টিভি চ্যানেলগুলোর মতো পেশাদারিত্ব না থাকলেও এর দর্শকসীমা হাজার হাজার বলে পলক নিজেই ঘোষণা করেন। এরকম সুযোগ আমার এই নিবন্ধটি লেখার সময়কাল অবধি আর কেউ পান বলে আমার জানা নেই। এই সম্পর্কে মিডিয়ার খবর হচ্ছে এরকম– 'বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের লাইভ ভিডিও সম্পর্কে মাধ্যমটির বেশিরভাগ ব্যবহারকারী অল্প-বিস্তর অবগত। ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জুকারবার্গ প্রায়ই বিভিন্ন লাইভ ভিডিও পোস্ট করে থাকেন। জুকারবার্গের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই ফিচারটি ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে ফিচারটি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ফিচারটি এখনও পর্যন্ত অল্প কিছু মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ। কয়েক দিন আগে ফেসবুক ঘোষণা দিয়েছিল এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাড়তি সুবিধা সংযোজনের জন্য আপাতত ফেসবুকের গবেষণাগারেই রয়েছে এটি।'

কিন্তু কতদিন এই প্রযুক্তি জুকারবার্গের ঘরে থাকবে? কোনো নিশ্চয়তা নেই যে কাল সকালেই সবার জন্য এটি উন্মুক্ত হবে না। যারা টিভির দিকে নজর রাখেন, তারা জানেন এখনকার টিভি চ্যানেলগুলোর জন্য সরাসরি সম্প্রচার কোনো ব্যাপারই নয়। এক সময়ে বিশালাকারের ওবি ভ্যান নিয়ে গিয়ে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হতো। এখন সম্প্রচারকেরা একটি ভিডিও ক্যামেরার সাথে ইন্টারনেট যুক্ত করে দিয়ে সরাসরি সম্প্রচার করে বসে থাকেন। অন্যদিকে স্কাইপের অহরহ ব্যবহার তো আছেই। যদিও আমাদের দেশে স্যাটেলাইট টিভি স্টেশনগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাদের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়, তথাপি দেশের নতুন জোয়ারের নাম সম্প্রচার টিভি।

অনলাইনের এক প্রতিবেদনে গত ২২ এপ্রিল বলা হয়েছে- 'প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা মনে করছেন ফেসবুকের এই ফিচারটি গণমাধ্যমের গতিধারাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করবে। পাল্টে দেবে অনেক কিছু। মোদ্দা কথা, গণমাধ্যমের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ফেসবুক লাইভ। ফেসবুক লাইভের প্রভাবের কারণে বিলুপ্তির পথে বসতে পারে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো।'

ইন্টারনেটভিত্তিক মিডিয়া কোম্পানি বাজফিডের প্রেসিডেন্ট জন স্টেইনবার্গ ফেসবুকের লাইভ স্ট্রিমিংকে টেলিভিশনের জন্য বড় হুমকি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাজফিডও ইন্টারনেটে লাইভ ভিডিওভিত্তিক ব্যবসায় পরিচালনা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সপ্তাহে পাঁচ দিন অন্তত এক ঘণ্টা করে লাইভ ভিডিও সম্প্রচার করছে। এ বছরের শেষের দিকে লাইভ ভিডিও প্রচারের পরিমাণকে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টায় উন্নীত করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

জন স্টেইনবার্গ বলেন, ফেসবুক লাইভ ভিডিও দিয়ে গণমাধ্যমের নতুন একটি ধারা তৈরি করছে, যা দ্রুত অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সবাই এ ধরনের মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফেসবুকের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমও লাইভ ভিডিওর দিকে দিনে দিনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

তিনি আরও বলেন, লাইভ ভিডিও টেলিভিশনের জায়গা দখল করবে। আমি মনে করি, দীর্ঘ সময় জুড়ে এই লাইভ ভিডিও রাজত্ব করবে, যতদিন পর্যন্ত আরও উন্নত কোনো প্রযুক্তি না আসে।

সম্প্রতি ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী এফ৮ ফেসবুক ডেভেলপারদের কনফারেন্সে চ্যাটবক্সকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, এতে যুক্ত করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ এটি চলবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

চ্যাটবট হচ্ছে একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম। ফেসবুক এর নাম দিয়েছে মেসেঞ্জার প্লাটফর্ম। বক্সে আসা বিভিন্ন মেসেজের উত্তর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিতে পারে। এজন্য এটি মানুষের কণ্ঠ নকল করে থাকে।

লাইভ ভিডিওর পাশাপাশি ফেসবুকে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ভিডিওটিও। সম্প্রতি এইচবিও চ্যানেলের টিভি প্রোগ্রাম গেম অব থ্রোনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ভিডিও আপলোড করা হয়, যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফেসবুকে সবচেয়ে বেশিবার ভিউ হয়ে রেকর্ড গড়েছে।

লাইভ ভিডিও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মিলিয়ে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিকমাধ্যম টেলিভিশনের অনেক শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তৈরি হচ্ছে। সবকিছু বিশ্লেষণ ▸

করে প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা বলছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভিডিওকেন্দ্রিক সম্প্রচার মাধ্যমে রাজত্ব করবে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লাইভ ভিডিও।

ফেসবুকে সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার করতে পারার মানে দাঁড়াবে, দেশে গত ২২ এপ্রিল ২০১৬-এর হিসাবে রাতারাতি ২ কোটি টিভি চ্যানেল গড়ে উঠবে। স্যাটেলাইটে বছরে ২৫ লাখ টাকা ভাড়া দিয়ে একটি সম্প্রচার ব্যবস্থার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে এই ফেসবুক। হয়তো প্রশ্ন উঠবে এসব চ্যানেল আদৌ কি পেশাদার টিভির বিকল্প হবে। প্রথমে যখন ইউটিউব চালু হয়, তখন তাকে ঠাট্টা-তামাশা হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু এখনকার কি অবস্থা?

আরেকটি অনলাইন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের চেয়ে ভিডিও শেয়ারিংয়ের সামাজিকমাধ্যম ইউটিউব বিজ্ঞাপন ৮০ শতাংশ বেশি কার্যকর। ইউটিউবের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান গুগল ও তাদের গবেষণা সহযোগী প্রতিষ্ঠান মার্কেটশেয়ার আটটি দেশের ৫৬টি কেস স্টাডি করে এ তথ্য জানিয়েছে।'

গুগলের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, টেলিভিশনে একটি বিজ্ঞাপন দিতে যে পরিমাণ খরচ হয়, তার চেয়ে ৬ গুণ কম খরচ হয় ইউটিউব বিজ্ঞাপনে। ফলে ইউটিউবে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। আর ইউটিউব বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতাও অনেক বেশি।

গুগলের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ম্যাট ব্রিট্টিন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন– 'আটটি দেশে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন পণ্যের বিক্রি বাড়াতে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের চেয়ে ইউটিউব বিজ্ঞাপন বেশি কার্যকর।'

একটি অনলাইন খবরেই আছে, 'মার্কেটশেয়ারের ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার লুসিয়েন ভ্যান ডার হোভেন জানান, গবেষণায় আমরা দেখেছি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানিতে টেলিভিশন বেশ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তবে এসব দেশে বিভিন্ন কারণে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে।

গুগল ও মার্কেটশেয়ারের গবেষকেরা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে আরও বেশি বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক টিভি মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান থিনবক্সের গবেষণা ও পরিকল্পনা পরিচালক ম্যাট হিল এ সম্পর্কে বলেন, টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে যে পরিমাণ খরচ হয়, বর্তমানে সে তুলনায় ক্রেতাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। অপরদিকে ইউটিউবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে অনেক বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

এ সময় টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন হিল। তিনি বলেন, টিভি বিজ্ঞাপন অবশ্যই অনেক বেশি মানুষের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা দিতে পারে। তবে এজন্য টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মান আরও বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে বিনিয়োগও।

ইউটিউবের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। এখানে বিজ্ঞাপনের বাজারটিও ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে, যা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জন্য ইতোমধ্যে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ হুমকি মোকাবেলায় টেলিভিশন বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রিকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

কোন ধরনের গবেষণা ছাড়াই সহজ-সরলভাবে এটি বলা যায়, প্রচলিত টিভির প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দিনে দিনে কমছে। বিষয়টি যে প্রচলিত সম্প্রচারকেরা অনুভব করেন না সেটিও নয়। তারা খুব ভালোভাবেই এটি বোঝেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির স্পর্শের বাইরে তারা থাকতে পারবেন না। এজন্য প্রথমে তারা ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন। সেখানে কিছু টেক্সট ও কিছু গ্রাফিক্স দিয়ে তাদের চ্যানেল ও অনুষ্ঠানাদির খবরাখবর দিতেন। এখন তারা নিজেরাই আইপি টিভিতে পরিণত হয়েছেন। এমনকি ইউটিউবে চ্যানেল খুলে তাদের অনুষ্ঠানগুলোও সেখানে তুলে দিচ্ছেন। অন্যদিকে সেখান থেকে করা হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব অঘটন ঘটানোর নায়ক হচ্ছে ইন্টারনেট। এটি নিয়ে নতুন ভাবনাটির নাম হচ্ছে ইন্টারনেট অব থিংস। এই ভাবনার মানে দাঁড়ায় আমাদের চারপাশে যেখানে যে যন্ত্রই থাকুক, সেটি ইন্টারনেটে যুক্ত থাকতে পারবে। যদি সেটিই বাস্তবায়িত হয়, তবে হাঁড়ি-পাতিল-থালা-বাসন-গলার হার বা আংটি টিভি দেখার উপযোগী হয়ে যাবে। তখন কে কষ্ট করে টেলিভিশন সেট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। হতে পারে ভিডিও-টিভির প্রচণ্ড আগ্রাসনের পরও সিনেমা যেমনটি বেঁচে আছে, টিভি তেমন করে আরও কিছু সময় বেঁচে থাকবে। কিন্তু প্রচলিত টিভি হয়তো এক সময়ে জাদুঘরেই দেখতে হবে। অন্যদিকে টেলিভিশনের কনটেন্ট বিষয়টিও বর্তমানের রূপটাতে থাকছে না।

আমি আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন এখানে ছোট করে তুলে ধরছি। এরা এদের প্রতিবেদনে সামনের দিকে তাকিয়ে টিভির কথা ভাবতে বলেছে। এদের মতে, সামনের দিনে ছয়টি প্রবণতা টিভির জগৎটাকে বদলাবে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, এজন্য টিভি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দর্শকদের সাথে আরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এমনকি তাদেরকে দর্শক-শ্রোতার পছন্দ-অপছন্দ জানার জন্যও বিনিয়োগ করতে হবে।

আমি মনে করি– বস্তুত টিভি বলি, সিনেমা বলি, রেডিও বলি বা পত্রিকা বলি এর বাহন হিসেবে ইন্টারনেটের একচ্ছত্র আধিপত্য গড়ে ওঠার পর এর বিষয়বস্তুর কোনো সীমানা থাকবে না। ফলে বিনোদন বা তথ্য-উপাত্ত যার যা খুশি তার সবই ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান টিভি ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরটা আসলে দেশে ইন্টারনেটের প্রসারের ওপর নির্ভরশীল। এখনও আমরা দেশের জেলা শহরগুলোতে থ্রিজি পৌঁছাতে পারিনি। খুব সামান্য গতিতে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার হয়। এটির পরিবর্তন মানে বাংলাদেশটারই পরিবর্তন। আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি, সেটি শুধু দেশের প্রতিইঞ্চি মাটিতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মাঝে এর মূল্য আসার ওপর নির্ভরশীল। টিভি-পত্রিকা-রেডিও-সিনেমা সব মিডিয়ারই একটি গন্তব্য– ইন্টারনেট।

খুব সঙ্গতকারণেই আমি মনে করি, টিভি দেখার যন্ত্র এবং সম্প্রচারের উপায়ে পরিবর্তনের পাশাপাশি রূপান্তরটা এর বিষয়বস্তু বা চরিত্রেও হবে।

আমি নিজে একাত্তর নিউজটিভি নামের একটি আইপি টিভির শুভেচ্ছাবাণীতে লিখেছি– 'রেডিও টিভি তো ইন্টারনেটেই থাকবে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ৮ লাখ, সেখানে ২০১৪ সালের অক্টোবরে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সোয়া ৪ কোটি। অঙ্কের হিসাবে এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে, তবে সামনের পাঁচ বছরে এই সংখ্যা ১১ কোটি অতিক্রম করবে। আমার মতে, ২০২৫ সালের মধ্যে সারা দুনিয়াতে এমন একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যার ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন না।'

কেউ কি চোখ বুজে কখনও ভেবে দেখেছেন, এর প্রভাবটা কোথায় কীভাবে পড়বে? অর্থাৎ পুরো জীবনটাই ইন্টারনেটনির্ভর হবে। আর এটিকে অবশ্যই 'ইন্টারনেট সভ্যতা' বলতে হবে। এমন দুনিয়াতে জীবনটা কেমন হতে পারে? বাসাবাড়িতে ইন্টারনেটের গতি থাকবে ২ গিগাবিট। ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প-কলকারখানা পরিচালিত হবে ইন্টারনেটে। জ্ঞানার্জন ইন্টারনেটে। সরকারও ইন্টারনেটে। প্রেম-ভালোবাসা-সামাজিকতা-বিনোদন– তথা জীবনধারা সবই ইন্টারনেটে।

তাহলে রেডিও-টেলিভিশনের কী হবে? কেউ টেলিভিশন সেটে টিভি দেখবে না? কোনো এক ধরনের ডিজিটাল ডিভাইসেই থাকবে সম্প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য মিডিয়া? বিটিআরসি থেকে তরঙ্গ বরাদ্দ নেয়ার প্রয়োজন হবে না। সেই কাজটি ইন্টারনেট সেবাদানকারীর জন্য সীমিত থাকবে। সম্প্রচারকারী ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথ কিনবেন। দর্শক-শ্রোতা রেডিও-টিভির সাথে ইন্টারেক্ট করবে। সম্প্রচারের সময় বলতে কিছু থাকবে না। ২৪ ঘণ্টা বলতে কিছু নেই। ৩৬৫ দিন নামেও কিছু নেই। খবর, নাটক, প্রামাণ্যচিত্র-চলচ্চিত্র– কোনোটাই কখনও মারা যাবে না। নিজের ডিজিটাল যন্ত্রে নয়, এরা সবাই থাকবে সাইবার আকাশে। ইন্টারনেটের মতোই সম্প্রচার বা মিডিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানা বলতে কিছু থাকবে না। হতে পারে ভাষার সীমানাটাও বিলীন হবে। এসব মাধ্যমে কনটেন্ট শুধু যে সম্প্রচারকারীই তৈরি করবেন তা নয়, সাধারণ মানুষ-দর্শক-শ্রোতাও অংশ নেবে এই মহাযজ্ঞে। তবে পেশাদারিত্ব বা সৃজনশীলতার সাথে কোনো আপস করা যাবে না। কমপিউটার প্রোগ্রামিং হবে সম্প্রচার মাধ্যমের কনটেন্ট নির্মাণের মূল স্রোত। সম্ভবত এরচেয়ে বেশি কিছু আমি এখন কল্পনাও করতে পারি না। তবে সহসাই ইন্টারনেটও থাকবে না– অন্য কোনো নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটের স্থলাভিষিক্ত হবে। যিনি বা যারাই সামনের আগামী এক দশকের জন্য সম্প্রচার মাধ্যমে বসবাস করতে চান, তাদের কাছে সবিনয়ে আবেদন হচ্ছে– কথাগুলো মনে রাখার জন্য কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com